ভুলে যাইনি

যশোধরা রায়চৌধুরি

স্মৃতি আমাদের ভারাতুর করে? না না, স্মৃতি তো আমাদের খুলেও দেয়। আমাদের দেয় উড়ান, আমরা আমাদের বয়সের খাঁচা ভুলি, আবার উড়ি, আবার উড়ি। ওরে ওরে ছাগলছানা উড়িস নে রে উড়িস নে, ভুলেই তো ছাগলছানা লাফায়। আর বয়স্ক ছাগ-মেষ কসাইখানায় সারিবদ্ধ যায়। কেননা তাকে যেতেই হবে কসাইখানায়। এটাই ভবিতব্য। চাকুরে-ব্যাবসায়ী-সুখী-অসুখী-ভালোমন্দ সব্বাই তাই নিয়মিত এভাবেই চলতে থাকে একটাই চক্রপথে। কেবলই ফিরে ফিরে দেখে ছোটোবেলা, দেখে অল্প বয়স। আর মুক্তি পায়, সাময়িক, ওই আনন্দে গিয়ে। অথচ জীবনে আনন্দের বাইরেও তো দুঃখ থাকে। সেসব শোক ভোগ আমাদের গায়েই লাগে না। আমরা ভুলে যেতেই পারি সেসব।

এই জীবনে কত কিছু হয়, হল। কিন্তু সবকিছুর পর, আমরা জেগে থাকি একটা দুটো আনন্দময় স্মৃতি নিয়ে। আমার সবচেয়ে আনন্দের স্মৃতি রবীন্দ্রসদনের উলটোদিকের ময়দানে মেলা দেখতে যাওয়ার। ওই জায়গাটিতে তখন সারা শীত এক্সপো-লেক্সপো-বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন-বইমেলা এমন হাজারও মেলা। ভাগ্যগুণে জন্মেছি দক্ষিণ কলকাতার মধ্যবিত্ত পাড়ায়। ভবানীপুরে। ভবানীপুরের এই পাড়াটি খুব নিরিবিলি তখন। বড়ো রাস্তার একেবারে কাছে কিন্তু বড়ো রাস্তার হুলুস্থূলটা এসে পৌঁছোয়নি। গাছপালা দেখা যায় চোখ বাড়ালে। আর অনেকগুলো বস্তি। একটু পুরোনো বস্তি সেগুলো, বিহারি বাঙালি ঘেঁষাঘেষি করে থাকে। এই পাড়ার কোনাচে একটা প্লটে আমাদের বাড়ি। একটেরে একটা চিলতে বারান্দা, অদ্ভুত গোলচে, পাঁচকোণা কয়েকটা ঘর। নীচে লাল গ্যারেজ। সব মিলিয়ে এই বাড়িতেই আমার তেত্রিশ বছরের জীবন কেটেছে। বাড়িটার নাড়ি আমার নাড়ির সঙ্গে মিশে আছে। আর আমার মায়ের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছে এই বাড়ি। এই বাড়িতে তিনি জীবনের চুয়াল্লিশটি বছর স্বামীহীন অবস্থায় দুই মেয়েকে মানুষ করেন। তারপর একগাদা বেড়াল, একটি কুকুর নিয়ে কাটিয়েছেন, আমার দিদি বিদেশ যাবার পর, আমি বিয়ে করবার পর মা শেষ দশটি বছর সম্পূর্ণ একাই কাটিয়েছেন ওই বাড়িতে। ও বাড়িতেই তাঁর যাবতীয় শিল্পচর্চা, গান ও আঁকা। অয়েল পেন্টিং। হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান, পরে বৈদিক মন্ত্রপাঠ। যাবতীয় লেখাপড়া, তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন। এ বাড়ির শ্বাসপ্রশ্বাসে দক্ষিণ কলকাতা আছে, ভালোবাসা আছে। পড়াশুনো, ধ্যানজ্ঞান আছে। সবটাই তাঁর নিজস্ব ডালপালা মেলে দিয়েছে আমার মধ্যে।

তো সেই ভবানীপুর থেকে আমরা এক বাসের, পাঁচ বাসস্টপের দূরত্বে ওই রবীন্দ্রসদন চত্বরে যখন তখন চলে যেতে পারতাম। আমি সৌভাগ্যবতী, আমার মায়ের হাত ধরে গেছি অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে ছবি দেখতে, গেছি নাটক দেখতে, গেছি প্রথম নন্দন

প্রতিষ্ঠার সময়ের ছায়াছবি দেখতে। আর ওইসব মেলায়, শীতের মিষ্টি রোদ্দুর পিঠে ঠেকিয়ে, প্রবল আনন্দে ঘুরতে ঘুরতে সামান্য কেনাকাটি আর অনেকটা অকারণ কেনার আনন্দে। গ্রামশিল্প লোকশিল্পকে উৎসাহ দেবার আনন্দও বটে।

সেই আনন্দের মধ্যেও তাহলে আছে কত না অন্য বিষয়। আমাদের জীবন সংস্কৃতিময় ছিল। ছিলই।

তবে, শুরু করি একেবারে শুরু থেকে।

শৈশব শুরুর কথা (১৯৬৫-১৯৭৫)

খুকুবেলায় ফিতের ফুল করা চুল, কিশলয়, অঙ্ক কষার বিভীষিকা, ইসকুলের বোঝা না বোঝায় মেশা কতগুলো দিন, মনে পড়ে। লাইব্রেরি থেকে শৈল চক্রবর্তী, শৈলেন ঘোষ, লীলা মজুমদার আর হরেক রূপকথা বা বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদ বইগুলি নেবার স্মৃতি আসে। সব শুদ্ধু এক জমজমাট ছোটোবেলা ছিল আমার, সতের জন মামাতো, মাসতুতো ভাইবোন সহ।

আমার বাবা মারা যান ১৯৬৬ সালে। আমার জন্ম তার আগের বছর, ১৯৬৫ সালে। কাজেই আমার মনে বাবার কোনো স্মৃতি নেই। শুধু স্মৃতিতে আছে বাবা ন্য থাকার জন্য সবার হা হুতাশ। আমাকে আদর করতে করতে ঝরে পড়া দুঃখ বেদনা, মন খারাপের ঢেউ, অন্যদের। অন্যরা, মানে আমার দিদা, আমার মাসি, মামিরা . . .। মায়ের দিক থেকে কখনো দুঃখ বেদনা দেখিনি। দেখেছি আগুন। দাঁতে দাঁত চাপা এক প্রবল মনের জোরের আগুন। কেননা তিনি একাকিনী। দুই সন্তানকে নিয়ে, স্বামীর স্মৃতি আঁকড়ে। বাপের বাড়িতে ফিরে যাননি, নিজের বাড়িতে থেকেছেন, জীবনের প্রায় শেষ দিন পর্যন্ত ভাঙা পুরোনো বাড়িটি ছেড়ে যেতে না চেয়ে।

তিরিশ বছর বয়সের বৈধব্যে যন্ত্রণাকাতর, কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা বলার লোক তিনি নন। জানেন, যেন অন্তহীন একনিষ্ঠা আর ব্রহ্মচর্যব্রত তাঁর মাতৃত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ। ''বাবা ছবির মধ্যে দিয়ে ওই দেখ তোকে দেখছে'' বলে, ড্রেসিং টেবিলের ওপর রাখা বাবার ছবিটার দিকে দেখিয়ে দিয়েছেন। তারপর থেকে বাবার স্মৃতি, বাবার গল্প, বাবাকে ঘিরে কত কথা। শুধু কথা দিয়ে আমার বাবা নির্মাণ, বাবা দর্শন। জীবনে ওই একটা শূন্যতা আমাকে অনেক দিয়েছে। বাবা হীনতা আমার জীবনে একটা ঘটনা। যা অনেক অন্য ঘটনাকে প্রভাবিত করে। সে সব দেখা শোনা বোঝা, কষ্ট দুঃখ, বেদনা, সব ধীরে ধীরে চোখের ওপর ফুটে উঠতে থাকবে সারাজীবন ধরে। এটাই নিয়ম। না পাওয়াকে পাওয়া ধরি, না থাকাকে চেটে চেটে খাই।

কিন্তু ফাঁকা জায়গা পড়ে থাকে না। একটা শিশুর মাথার মধ্যে শুধু তথ্যরা জমা হয়। সেই পরিস্কার কালো স্লেটে একে একে আঁচড় পড়ার মতো জমা হয়ে ওঠে ঘটনা, কত কত

ঘটনা। ইংরেজ এম্পিরিসিস্ট দার্শনিক জন লক বলেছিলেন মানুষের মন ফাঁকা স্লেট। শূন্য ব্ল্যাকবোর্ড। একের পর এক জমা হয় অনুভব। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা। শৈশবের কথা ভাবলেই মনে হয় ছায়াছবির মতো, মিছিল করে আসছে ইন্দ্রিয় অনুভবের সারি। স্মৃতিচারণ মানেই শুধু ইন্দ্রিয় অনুভবের লম্বা, অনন্ত একটা ফিতে। ঘর্ঘর করে চালু হয়ে যায় মোটর আর ঘুরতে থাকে ছবির সারি।

শিশুর মাথায় না পাওয়ার তথ্য থাকে না কোনো, পাওয়ার তথ্য থাকে শুধু। অনেক মানুষের মুখ। লোকের বাড়ি, রেস্টুরেন্টের গন্ধ। রোদ্দুদের ছোপ। আলোয় ঘুরতে ঘুরতে মাটিতে পড়ে যাওয়া ধুলোর কণিকা। পাশের বাড়ি থেকে ভেসে আসা বিবিধ ভারতীর গান। অনেক দূর থেকে আসা আর.ডি. বর্মণের সুরের ঢেউ, অ্যানুয়াল পরীক্ষার পড়া। পুজোর আকাশ। ফুচকার ঘ্রাণ। হেমন্তের হিম হিম বিষাদ আকাশ। ছাপ ছাপ কাপড়, তেল লংকা মাখানো তেঁতুলের স্বাদ। ভালো লাগার গন্ধ। মন্দ লাগার নাছোড় অভিজ্ঞতা।

সেই কোন ছোটোবেলায় মনে আছে উত্তরদিকে সূর্য ঘুরে যাওয়ার কথা। আমাদের শোবার ঘরের জানালায় পুজোর সময় থেকে একটু একটু করে সকালবেলায় রোদ্দুর আসত। সেই রোদ্দুরের গন্ধ আলাদা, সেই রোদ্দুরের আঁচ অন্যরকম। একটা কোণাকুণি রোদ। যে রোদ দেখলেই মনে হয় শীত আসছে, কমলালেবুর গন্ধ পাওয়া যায় আন্দাজে। যে রোদ্দুর দেখলেই মনে হয় পুজোর পর অ্যানুয়াল পরীক্ষা। বুকটা অকারণে হু হু করে। মা মোড়া পেতে বসে থাকেন রোদে, সকালে কাগজ পড়েন।

রেডিও যাপন

আমাদের বাড়িতে সারাদিন রেডিও চলত। আর সকাল পৌনে আটটার রবীন্দ্রসংগীত ছিল অমার ঘুম ভাঙার গান। সব অর্থে। লেপ তোষকের মধ্যে থেকে জেগে উঠে চুপটি করে শুয়ে থেকে থেকে গান শোনা। আবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হবার গানও। প্রথম প্রেম কী, জানতে পারলাম রবি ঠাকুরের "তুমি একটু কেবল বসতে দিও পাশে" দিয়ে। প্রথম শব্দ শেখার দিনগুলো, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সংবাদ পরিক্রমা আর সংবাদ বিচিত্রা শোনার দিন। বড়ো হতে হতে কী ভালো লাগত বৃন্দ গান, ভালো লাগত সুগম সংগীত। মঙ্গলবার রাতের শ্রবণী। রবিবার দুপুরের বোরোলিনের সংসার। নাটকের হিরোরা কল্পিত পুরুষ সব। জগন্নাথ বসু বা গৌতম চক্রবর্তীর মতো সুপুরুষ কণ্ঠ কতদিন অচেনা প্রেমিক হয়েছে।

কলকাতা 'ক' ছিল আমাদের বাড়ির একটা এক্সটেনশন, আমার মায়ের পালানোর রাস্তাও হয়তো। রুটি করতে করতে, তরকারি রাঁধতে রাঁধতে, এটা ওটা সেটা করতে করতে, অসংখ্য ঘরের কাজের মধ্যে মায়ের রেডিও শোনা কলকাতা 'ক'-এর ভিতর।

অনেক পরে দিদি 'খ'-তে ইংরেজি গান শুনত। লাঞ্চ টাইম ভ্যারাইটিজ। আর বিবিধ ভারতীর বিজ্ঞাপন, টিং টং, হিন্দি গান নিষিদ্ধ ছিল ভিক্টোরিয়ান মাতৃদেবীর সংসারে। ওটা পাশের বাড়ির থেকে ভেসে আসত। সেই সব অমর গান। আশা ভোঁসলে, চুরা লিয়া হ্যায়।

আমাদের মন জিওগ্রাফি থেকে চুরিয়ে নিত সেই গান।

আর হ্যাঁ, আমার দিদার বাড়িতে রাশি রাশি বেতার জগৎ ছিল। এই পত্রিকাটি বেরোত রেডিও প্রেমীদের কথা মনে রেখে। এতে পাওয়া যেত শিল্পীদের কালো সাদা ফটোগ্রাফ। ফ্যানেরা যে ফটো কেটে কেটে তাঁদের জাবদা খাতায় সাঁটাতেন। আর প্রোগ্রামের সময় তারিখ পাওয়া যেত যেমন, তেমনি ভালো ভালো কয়েকটি প্রবন্ধও থাকত। বেতার জগৎ সম্ভবত ষাটের দশকে শেষের দিকেই বন্ধ হয়ে যায়। কেননা আমি যা দেখেছি তা সব পুরোনো বেতার জগতই।

কিন্তু সে বেতারের মহিমা তখনও আকাশে বাতাসে ধ্বনিত অনুরণিত। পাড়ায় পাড়ায় হাঁটতে হাঁটতে পেয়েছি আস্বাদনের নতুন নাম, অন্য বাড়ির রেডিও থেকে ভেসে আসা গান। চুরি করে খাবার খাওয়ার মতো সুস্বাদু যা। জীবনের অনেকটাই ভরে দেয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন, "কোনো বন্ধুর বাড়ির সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে কণিকার রবীন্দ্র সংগীত রেডিওয় শুনে অমোঘ রোমাঞ্চের কথা, আমার অমনি অনেক রোমাঞ্চ আছে বৈকি। তখন সবারই থাকত।

বই যাপন

ইতিহাস, ভূগোল জঘন্য লাগত আমার। অঙ্ক খারাপ লাগলেও, চ্যালেঞ্জ ছিল একটা। বিজ্ঞান খুব ভালো লাগত। আর বাংলা, ইংরেজি সবচেয়ে আনন্দ দিত। সেই সব পড়ার মধ্যে, 'পড়া' ব্যাপারটাই জঘন্য ছিল আমার কাছে। আর পড়ার বইয়ের তলায় রেখে শরদিন্দু পড়া, পুজোসংখ্যায় সমরেশ বসু, সুনীল গাঙ্গুলি পড়া, শুরু হয়ে গেছে ক্লাস সেভেন থেকেই। ফেলুদা খুলে রেখে পাতা উলটে উলটে রমাপদ চৌধুরির 'পিকনিক' বা 'এখনই'-র মতো অসাধারণ উপন্যাস পড়া, তরুণ তরুণীদের প্রেম-ভালোবাসা-আশা-আকাঙ্ক্ষার গপ্পো। সঙ্গে সুধীর মৈত্রর সেই অনবদ্য স্কেচ ইলাস্ট্রেশনগুলো।

তার আগে সব ভালো ভালো ছোটোবেলার বইগুলো যা মা-ই হাতে তুলে দিয়েছিলেন, পড়েছি লাল শানের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে। ছোটোবেলায় ভীষণ ভালোবাসতাম বই, একেবারেই ছোট্ট থেকে সুর, ছবির আর বইয়ের জগতেই বড়ো হয়েছি। মা ছিলেন পেন্টার এবং গায়ক। মায়ের হাত ধরেই গেছি অ্যাকাডেমিতে ছবির একজিবিশনে। গেছি গান শুনতে। তেমনই, প্রথম যখন মায়ের হাত ধরে বইমেলায় যাওয়া শুরু হয়, সে এক অন্য উত্তেজনা। ওই উত্তেজনার সঙ্গে মিলেমিশে ছিল নতুন বইয়ের গন্ধ। নতুন বইয়ের গন্ধ আবার দু-রকম। ইংরেজি নতুন বই আর বাংলা নতুন বইয়ের গন্ধ আলাদা।

আবার নতুন বই আর পুরোনো বইয়ের গন্ধও তো কত আলাদা। আর দুটোই কী প্রিয়। পুরোনো বই পড়তাম দিদার বাড়িতে। আমার দাদামশায় একদা কারমাইকেল কলেজ, রংপুরে অধ্যক্ষ হিসেবে কাজ করেছেন। সাংঘাতিক জাঁদরেল অঙ্ক শিক্ষক তথা ভারতীয় জনসঙ্ঘের একদা প্রেসিডেন্ট দেবপ্রসাদ ঘোষ। পণ্ডিত হিসেবে খুবই নামডাক ছিল তাঁর। চলন্ত এনসাইক্লোপিডিয়া বলা হত। আমরা যে দাদুকে দেখেছি তিনি অশীতিপর, স্মৃতি চলে গেছে। কিন্তু তাঁর উত্তরাধিকারী সেই সব বইয়ের ধুলোর একটা মাদক গন্ধ, বৈঠকখানায় অসংখ্য পুরোনো বই কলকাতার বাড়িতে ছিল। মূলত দাঁত ভাঙা ইংরেজি বই। ওপরের তলাতেও অসংখ্য বই এবং সেই সব বই ঘেঁটে কিন্তু যা পেতাম তাই চেটেপুটে পড়ে ফেলতাম। নীচের তাকের পঞ্জিকাগুলো নিয়ে বসে আমাদের শৈশবে পাঁজির বিজ্ঞাপন এখনকার শৈশবে ফ্যাশন টিভি বা বড়োদের সিরিয়াল দেখে পেকে ওঠার বিকল্প ছিল।

তাছাড়া কাশীদাসী মহাভারত কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ ধর্মসংক্রান্ত গ্রন্থ এগুলো, দেখতাম মূলত ছবির টানে।

ছবি যাপন

ছোটোবেলায় মাকে দেখেছি ক্যানভাসে তেল রং বুলিয়ে ছবি আঁকছেন। সেই দেখার সঙ্গে মিশে গেছে তার্পিন তেলের গন্ধ। তেল রঙের গন্ধ আমাকে এখনও আকুল করে। আমি কোনোদিন সেই সব রং দিয়ে আঁকিনি। কিন্তু আমি তো খুব ছবি আঁকতাম জল রং দিয়ে। অনেকক্ষণ ধরে মায়ের কেটে দেওয়া চার্ট পেপার, রিসাইক্লিং করা নানা ধরনের ক্যালেন্ডারের পাতা বা অন্যান্য ভালো কাগজের ওপর এঁকে যেতাম। আঁকার খাতা প্রচুর কিনে দেবার মতো বিলাসিতা আমাদের ছোটোবেলায় বাবা-মায়েরা করতেন না। অংক কষতাম সের দরে কলেজ স্ট্রিট থেকে কিনে আনা দিস্তে কাগজ নিজেরা সূচ সুতোর ফোঁড় দিয়ে খাতা বানিয়ে। বঙ্গলিপি খাতা উঠল আমাদের এইট নাইন মানে ১৯৭৯-৮০ নাগাদ। রেশনে সেই সব খাতা পাওয়া যেতে শুরু করল যখন, কেনা হত অনেকগুলো করে।

এই ছোটোবেলার আঁকার অভ্যাস আমার হারিয়ে গেল কিছুটা বড়ো হতেই। কেননা আমার কোনো আঁকার মাস্টারমশাই ছিলেন না। বন্ধুরা কম্পিটিশনে প্রচুর এগিয়ে গেল, প্রাইজ টাইজ পেতে শুরু করল। আমার আঁকার ইচ্ছেটা জমা রইল। পরে অন্যভাবে বেরিয়ে আসবে বলে।

খেলাযাপন

আমার ছোটোবেলার খেলাধুলো পুরোটাই মামাতো ভাইবোনদের সঙ্গে, মামার বাড়িতে। পাড়ায় খেলতে দিতেন না মা, কর্তৃত্বময়ী, আগলে রাখা, সাবধানী মা আমার। আর মামার বাড়ি আমাদের সেফ হেভেন।

আগেই দাদুর কথা বলেছি। আমার দিদু এক অসমান্য মহিলা। সেই ভালোবাসা, সেই আদর আমাকে মাইলের পর মাইলের শক্তি জুগিয়ে চলে। সেই দিদুর পরিবারের ছত্রছায়ায় যৌথ পরিবারের পটভূমিতে যে কোনো ছুটিতে সে বাড়িটি কেঁপে উঠত অসংখ্য ছোট্ট ছোট্ট হাত পায়ের দৌরাত্মে। প্রচুর ভাইবোন আমরা। গুণে দেখলে সতের জন। মায়ের ছয় ভাই, এক বোন। সবার ঘরে দুটি করে সন্তান গড়ে। সবসময় সবাই থাকত না। কিছু কিছু কমন থাকত, যারা কলকাতাবাসী। বাকি সব বম্বেতে, নিউ ইয়র্কে, লন্ডনে। যখন আসে বাড়িতে তুমুল খেলাধুলো আর আড্ডার ঝড় বয়ে যায়।

সবচেয়ে প্রিয় খেলা ছিল, দিদুর বাড়ির ওপরের ঘরে, একটা ফাঁকা খাটে হুটোপাটি করে জলদস্যু জলদস্যু খেলা। এক ভাই জানালাটা দড়াম দড়াম করে পেটাত, ওটা বজ্রবিদ্যুৎ। একটা কোলবালিশ হত কাঠের ভেলা। সেটা আঁকড়ে আমরা ভেসে যাচ্ছি। এই খেলার আনন্দ আজও একটুও বাসি হয়নি। পরে, ট্রেন বা বাস খেলতাম, টিকিট বানাতাম ছোটো কাগজে। সেই খেলায় আমার এক দাদা বেজায় বদমাইশি করত। প্রতিবার ট্রেনে বা বাসে ওঠার সময় বলত, তোমাকে উঠতে দেওয়া যাবে না, নামের সঙ্গে চেহারা মিলছে না, অমুক হয়নি, তমুক হয়নি। আর রেগে কাইমাই করে হাত পা ছুঁড়তে শুরু করতাম। চোর পুলিশ খেলতাম খুব, খুব খেলতাম কুমির ডাঙা, ছাদে।

খেলা শেষ হলে গল্প। অন্তাক্ষরী। অন্তাক্ষরীতে বানিয়ে বানিয়ে গান তৈরি করত এক মামাতো দাদা। সে সব গান বহুদিন অব্দি মনে থেকে গেছে আমাদের। প্রচণ্ড হুজ্জোতি আর আনন্দের স্মৃতি এই দিদার বাড়ি আর সমস্ত ভাইবোনদের ঘিরে আমার। মামাতো পিসতুতো ভাইবোনের থেকে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম অনেকটাই বঞ্চিত হচ্ছে, আর তার পরের প্রজন্ম ওই শব্দগুলোই জানবে না। একক একাকী মানুষের সংখ্যা বেড়ে যাবে সর্বত্র।

চিঠিযাপন

এরই সঙ্গে বলে নিতে হবে অন্য একটা তথ্য। আমরা চিঠিপত্রের শেষ প্রজন্ম। পাতার পর পাতা চিঠি লেখার আনন্দ, কাগজে আর কলমে, নানা রঙের কালিতে, জীবনের শুরুর দিক থেকে পঁয়ত্রিশ-চল্লিশ বছর অব্দি পেয়েছি যে, এই আনন্দই অমোঘ।

সেই যে ইস্কুলের বন্ধুদের গরমের ছুটিতে পোস্ট কার্ড লেখার বাধ্যবাধ্যকতা। কোথাও বেড়াতে গেলে পিকচার পোস্টকার্ড পাঠানোর অবশ্যম্ভাবিতা। সেই এক বা একাধিক পেন ফ্রেন্ডের সঙ্গে অসংখ্য চিঠি বিনিময়। মায়ের তদারকিতে বড়োদের লেখা 'শ্রীচরণেষু' দিয়ে শুরু করে শুদ্ধ পবিত্র বানান ভুল হীন বিজয়া বা নববর্ষের প্রণামী চিঠি। লিখে যা একবার মাকে দেখাতে হত বলে, মজাই মাটি লেখার! দিদাকে তবু কত লিখেছি, ভালোবাসতাম তো খুব, তাই সে চিঠির আনন্দ অন্য।

দূরে বা বিদেশে থাকা ভাইবোনদের চিঠি লেখার স্মৃতিটা অন্য। খুব মজার। নীল রঙের ইনল্যান্ড লেটার বা একটু লম্বাটে এয়ার লেটারে ভাগাভাগি করে লেখা হত। মায়ের জন্য মুখ্যাংশ রেখে, বাকিটা আমি আর দিদি ভাগ করে নিতাম। ভাইবোনদের জন্য একটু দুষ্টুমি ভরা কথা বারোয়ারি চিঠিতে লেখার চ্যালেঞ্জ আলাদা। মাতৃচক্ষু এড়িয়ে অতি সন্তর্পণে।

শৈশব-কৈশোর (১৯৭৫-১৯৮৪)

টিভি যাপন

যখন বড়ো হয়ে গেলাম, তখন বাড়িতে এসে গেছে টিভি। প্রতি রোববার সকালে রাস্তাঘাট শুনশান হয়ে যায়। কেননা, মহাভারত!

এই সময় হিন্দি গানের সেই বিবিধভারতী দূরে চলে গেল। হিন্দি ছবি এসে পড়ল শোবার ঘরে। মধ্যবর্তী আশির দশক, সেই সময়েই কিন্তু প্রতি বুধবার চিত্রহার দেখার চল হয়েছে, কালো সাদা টিভিতে সেটা আমরা দেখতাম পাশের বাড়িতে আর শনিবারের হিন্দি চিত্রমালা (ভুল বলছি না তো?) দেখা, তাও মামার বাড়িতে। পড়াশুনোর ক্ষতি হবে ভেবে আমার মাতৃদেবী সাংঘাতিক পণ করেছিলেন কৃচ্ছ্রসাধনের। ১৯৮৮ সাল অব্দি বাড়িতে টিভি না থাকায় বন্ধুদের আড্ডায় যত টিভি সংক্রান্ত গল্প সেগুলির রসে বঞ্চিত থেকেছি আমি, অন্যদিকে তেরো পার্বণ-এর মতো নামজাদা সিরিয়াল, অথবা হিন্দি বহুল প্রচারিত ভালো অভিনয়ের সিরিয়ালগুলি আমার কাছে অধরাই থেকে গিয়েছে।

আমরা সাদা কালো টিভি নয়, একেবারেই রঙিন টিভিতে উত্তীর্ণ হয়েছি। তখন ডিডিওয়ানে দিল্লির খবর, সপ্তাহে একদিন পরবর্তী এনডিটিভি খ্যাত প্রণয় রায় কৃত প্রথম ওয়ার্ল্ড দিস উইক দেখার উন্মোচন-সচেতনতা-জিকে বৃদ্ধি! এবং অসাধারণ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান সুরভি বা তানা বানা দেখা, সেও ডিডিওয়ানেই, যাতে রেণুকা সাহানি নামে এক উজ্জ্বল ঝকঝকে মহিলা আমাদের মন কাড়লেন, সিদ্ধার্থ কাক ও গীতা সিদ্ধার্থ এই দম্পতিও।

ডিডিটু-তে সম্ভবত ছিল কলকাতার চ্যানেলের নাম, তখন। সেখানে রবিবারের সিনেমা, বিকেল চারটে থেকে, দেখতেই হবে। তার আগেই দেখব, নিয়ম করে ঋতুপর্ণ ঘোষ নামে এক নতুন ছেলের তৈরি বোরোলিনের বিজ্ঞাপন, আর অবশ্যই ধারা সরষের তেলের বিজ্ঞাপনে মন ভালো হয়ে যাবে ঝকঝকে ইলিশ মাছ ভাজার চিত্র দেখে।

ডিডিথ্রি-র কথা কতজনের মনে আছে জানা নেই। এটি ছিল দিল্লিরই, কিন্তু ভিন্ ধারার, এতে সংস্কৃতি সংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠান খুব খুব ভালো ছিল। সালটা ১৯৮৮-৮৯। একাধিক ভালো বিদেশি ছবি অনেক রাতে দেখান হত।

১৯৮৪ সালে প্রেসিডেন্সিতে ভর্তি হলাম দর্শনে এমএ করব বলে। এক দশক আগেকার নকশাল দর্শন তখনও বাতাসে। আকাশে আকাশে ফেরে গুঞ্জন, সিপিএম শাসনের তলায়

তলায় চলে বিড়বিড়, নকশাল আন্দোলনের গল্প। কলেজে এসএফআই করা ঝকঝকে ছেলেমেয়েরা অন্যদিকে, আর তুখোড় মেধাবী নকু নেতারা একদিকে। আমাদের বন্ধু সব এক্স নকুরাই। অতি বাম আমাকে, আমার বন্ধুদের সবাইকে বেশি মাতিয়েছিল।

এই সময় কবিতা লিখতাম। কিন্তু শক্তি চাটুজ্জের নকল করতাম বেসিকালি। ছন্দে হাত পাকাতাম। ভালো হত না। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকায় লেখা জমা দিলাম। অধ্যাপক সুকান্ত চৌধুরি বাতিল করলেন। আরও গুটিয়ে গেলাম। আশেপাশে আঁতেল শিরোমণি সৌম্য দাশগুপ্ত, অপূর্ব সাহা, অদ্রীশ বিশ্বাস, অচ্যুত মণ্ডল, অনেকেই ঘুরে বেড়ান। বড়ো যারা তাদের দিকে তো অবাক বিস্ময়ে তাকাই। কবিতা লিখতে গেলে মনে হয় ওরে বাবা, এদের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে! তাই লেখাগুলো গোপন ডায়েরিতেই থাকে।

তরুণের লিবারল দশক নব্বই দশক (১৯৮৮-১৯৯৯)

এর পর পর, নব্বই দশকে, কেব্‌ল টিভি এসে গেছে। এসে গেছে আটাত্তরটা চ্যানেলের হাতছানি। উদোম নির্লোম পায়ের মেয়েদের দেখছি সে টিভিতে। বে-ওয়াচ। দিশি বিদিশি বিকিনি সুন্দরীদের জয়গান। আর কয়েক বছরের মধ্যেই বিশ্বসুন্দরী হবেন সুস্মিতা সেন। তারপর ঐশ্বর্য রাই। চিরজীবন সুন্দরী থাকা হয়ে উঠবে বাধ্যতামূলক।

আমাদের মায়েদের সে দায় ছিল না। চল্লিশের পর থেকে তাঁরা সাদা শাড়ি পড়তেন। তাঁরা ভুরু প্লাক করতেন না, তাঁরা মেকআপ পরতেন না। যাঁরা পরতেন তাঁরাও বাধ্য ছিলেন না পরতে। ভালো লাগত বলে অনেকেই পরতেন হয়তো। তবে মধ্যবিত্তের নির্বাণ লাভ হয়নি তখনও শপিং মলে। কুর্তি আর লেগিংস ভারতের জাতীয় পরিধান হয়নি।

তার মানে এই নয় যে এগুলিকে খারাপ বলছি। আসলে আমি আমার জীবনকালে এক প্রজন্মের মধ্যে এ পরিবর্তন দেখেছি। আমার আত্মজৈবনিক উপাখ্যানও তাই। কারণ ওপরে যা যা বলেছি সেগুলি আমিও করি। ভুরু তুলি, চুল রং করি। ঝকঝকে থাকি। রঙিন জামা পরি।

বাজার অর্থনীতির উন্মুক্ততা, মনমোহনমিক্স, ১৯৯২-তে আমাদের দেশের দরজা বিবিধ পাশ্চাত্য পণ্যের দিকে খুলে দিয়েছিল শুধু নয়, অনেকগুলি মূলগত পরিবর্তন এনেছিল। তার সুফল পাচ্ছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম।

১৯৮৯ তে দর্শনে এমএ পড়ছি যখন, তখনই হঠাৎ এক কাণ্ড হল। ১৯৮৭ তে বিএ ফাইনালের পর দীর্ঘ অবসর ছিল, সে সময়ই ফর্ম ফিলাপ করেছিলাম বিসিএস পরীক্ষার। তার আগে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি খায় না মাথায় মাখে তাও জানতাম না। ডুবে থাকতাম অস্তিত্ববাদ ইত্যাদি লেখাপড়ায়। নেহাত খেলাচ্ছলে পরীক্ষায় বসা বিসিএস-এর ফল বেরোল, ইন্টারভিউয়ের ডাক পেয়েছি লিখিত পরীক্ষায়। প্রথম মুদিয়ালিতে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসে ইন্টারভিউ দিতে গেলাম। আমাকে গুরু গম্ভীর প্রশ্ন না করে

আলুর দাম, গ্যাসের দাম এইসব জিজ্ঞেস করা হল। নেহাতই কচি কিনা, বয়স মাত্র এই একুশ বাইশ। ওঁরা ভেবেছিলেন মেয়েটা একেবারেই গজদন্ত মিনারের অধিবাসী, কিছুই জানে না পৃথিবীর খবর। আমি তখন নিয়মিত বাজার করি, বাড়িতে মাকে সাহায্য করার অভ্যেস আছে। এমনকী কোনো ফিউজ উড়ে গেলে টুলে উঠে ফিউজও সারাই।

এভাবেই ফোকটে চাকরি হয়ে গেল। যোগ দিলাম হুগলিতে, প্রবেশনার হিসেবে। সত্যিই গজদন্ত মিনারের অধিবাসী ছিলাম। ডিস্ট্রিক্ট কালেক্টরের অফিসের সেই বিশাল ওলন্দাজদের তৈরি ভবন, কোর্টের চিৎকার, ভিড়, কালো কোট, ছোটো ছোটো সব খাবার, চা, পানের দোকানের গ্যাঞ্জাম, কিলবিলিয়ে ওঠা মানুষ, মানুষ, রিক্সা, অ্যামবাসাডর, সরকারি জিপগাড়ি এই আমি প্রথম দেখলাম। ডেলি পাষণ্ড হলাম হাওড়া থেকে রোজ সকাল নটা সতেরোর ব্যান্ডেল লোকালে। পৃথিবীর অন্য একটা মুখ দেখা শুরু হল, ডাইং ডিক্লারেশন নিতে গেছি সরকারি হাসপাতালে, পুড়ে খাক হওয়া গৃহবধূর। কথা বলকে কী, মৃত্যু পথযাত্রিণী সে মেয়েটির চোখের গোলাপি ঠেলে আসছে পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া মুখমণ্ডল থেকে। শরীর কাপড় নেই, শুধু একটা পাতলা গজের টুকরো ফেলে রাখা। ভয়ানক বেদনাবহ দৃশ্যের সামনে সরকারি ডাক্তার ও সরকারি আমলার স্থির উদাসীন কর্তব্যপরায়ণতা তখন প্রথম দেখলাম, শিখলাম। মর্মে নিলাম।

এই চাকরিতে দু-তিন বছর ছিলাম। তারই মধ্যে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা দিতে বসলাম, সেও হুগলিতে আইএ দাপট দেখেই। ভারি শখ ছিল, আইএএস হব। পরীক্ষা দিলাম, পেলাম অডিট সার্ভিস, আসলে আইএএস-এর র‍্যাঙ্ক না থাকলে অ্যালাইড সার্ভিস-এর অপশনে প্রথমেই রেখেছিলাম অডিটের নাম। কেননা আমার মামা অমিতাভ ঘোষ রাঁচিতে এ.জি ছিলেন। এ.জি অফিসের শান কিছু কম ছিল না আমাদের চোখে।

আমি যে চাকরিটা করি, সেটা ভারতের সিভিল সার্ভিসের অন্তর্ভুক্ত। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন আট থেকে নয়শোটা ফাঁকা পদ পূরণ করে একটা পরীক্ষার মাধ্যমে। সেই পরীক্ষায় যারা ছাঁকনিতে ছেঁকে ওঠেন, তাঁদের মধ্যে আবার মেরিট অনুসারে, এবং তাঁদের পছন্দের তালিকা অনুসারে, নানা সার্ভিসে অ্যালট করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ, কে বাকি জীবন কী কাজ করবেন সেটা নির্দিষ্ট হয়ে যায় পরীক্ষার ফল বেরোবার সঙ্গে সঙ্গেই। সুতরাং, ১৯৯১ সালের পরীক্ষার ভিত্তিতে আমার চাকুরিপ্রাপ্তির পর পরই নির্ধারিত হয়ে যায়, আমি ভারতীয় অডিট ও অ্যাকাউন্টস সার্ভিসের সদস্য হব।

ভারতে আইএএস-এর সম্বন্ধে বলা হয় রাজার চাকরি। কেন তা বলা হয়? কেননা, ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট কালেক্টরের যে মূর্তিটি একদা নয়া জমিদারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল (শোলা হ্যাট ও সাইকেল সহকারে), তা ক্রমে ক্রমে ওয়েলফেয়ার স্কিম অর্থাৎ সরকারের যাবতীয় দান খয়রাতের মূল হাতিয়ার হয়ে উঠেছে। সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের মূল কাঠামোটা আইএএস-দের মধ্যে দিয়েই জনগণের সঙ্গে যোগ রেখে চলে, অন্যদিকে, এই

সার্ভিসটি প্রকৃতপক্ষেই সরকারের ডানহাত হিসেবে বেশ কিছু সুযোগ সুবিধা ভোগ করে। অসুবিধা যে কিছু নেই তা নয়। যেমন রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধাচারণ করলে, তার ফল হতে পারে সপাটে অন্যত্র পোস্টিং, বোরা বিস্তার বেঁধে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যেতে হতে পারে।

সে চাকরিতে যোগ দিয়েই যেতে হল সিমলা। তখনও ডায়েরির গোপন পাতায় শুধুই লেখালেখি। বাইরে বেরোয়নি কিছু। সিমলায় দু বছরের ট্রেনিং। বাড়ি ফেরা বারণ প্রায়। বছরে একবার ছুটিতে আসা। বাকিটা শীতে জবুথবু আমি সেই পাহাড়ি শহরের পাকদণ্ডিতে বাকি ঊনত্রিশ জন ব্যাচমেটের সঙ্গে। খুব নীরব আকাশ, পাখির ডাক, পাতাঝরা কনিফারদের মধ্যে হারিয়ে যেতে থাকলাম। মন খারাপের ভিতর। এক আধখানা ভেঙে যাওয়া প্রেমের স্মৃতিতেও লাট খাচ্ছিলাম। সব মিলিয়ে চাপ তাপের জীবন। দেশ পত্রিকা রাখছি ডাকযোগে। রুমমেট কবি বাসুদেব দেবের কন্যা সুপর্ণা দেব। খুব কবিতা পড়ি তখন। আলাপ আলোচনা চলে কবিতা নিয়ে। আর পড়ি মিলান কুন্দেরা। তার আগে সার্ত্র-কামু-কাফকা পড়া হয়েছে কলেজ জীবনে। প্রেসিডেন্সিতে পড়তাম দর্শন নিয়ে। কাজেই প্রেসি ক্যান্টিনের আঁতলামির সঙ্গে ভালোই পরিচিতি ছিল।

কিন্তু এই প্রবাসে আমার মধ্যে অন্য একটা প্রত্যয় এল, একাকিত্বের প্রত্যয়। দেশে লেখা পাঠালাম। কবিতা। আমার বন্ধু সুপর্ণা বলল, তুই গল্প আধাখ্যাচড়া লিখে ফেলে রাখছিস বটে, তবে কবিতাটাই তোর আসল জায়গা। ওদিকেই মনোনিবেশ কর। তোর হাতে কবিতাটা আছে। ওই জোরটা না পেলে পারতাম না।

সেই লেখাটি দেশে ছাপা হল। একটি চিঠিতে জয় গোস্বামী জানালেন, মনোনয়নের কথা। আমাকে আর পায় কে!

ইতিমধ্যে সিমলা থেকে এলাম রাঁচিতে, বছরখানেক পরে কলকাতায়। ট্রেজারি বিল্ডিং ইন্সটিটিউটে চাকরি শুরু। অ্যাসিসটেন্ট জেনারেল দিয়ে এই রাস্তা চলা শুরু হয়। পেনশন ডিভিশনের কাজ দিয়ে শুরু হল।

তারপর একে একে ডেপুটি অ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেল হিসেবে কলকাতাতেই ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৯ রইলাম। সেই দিনগুলো ছিল বাড়ি-অফিস-ট্যুর-ট্রেনিং এর। ভিতরে ভিতরে কেরিয়ার গড়ার সুখ, অথবা স্বাধীনতার আস্বাদন। একা একা সিমলা-কলকাতা-দিল্লি—এদিক ওদিক ঘোরার একটা অভ্যাস গড়ে উঠেছে। একলা হোটেলে রাত্রিযাপন করা, পাশের ঘরের 'গল্প বইয়ের চরিত্র'দের ওপরে নজরদারি করে খাতায় নোট নেওয়া। তাও ঘটেছে।

রাতের বাসে পনেরো ঘণ্টার জার্নি করে সিমলা থেকে ডালহৌসি যাওয়ার কথা কোনোদিন ভুলব না। ভুলব না হলদিয়ায় ট্যুর, উত্তরবঙ্গের ট্যুর। একা অথবা

সহকর্মিণীদের সঙ্গে। বেতলার অরণ্যে ঘোরাঘুরি, তাও আমাদের সরকারি কানেকশনেই, রাঁচিতে যখন পোস্টিং তখন।

বিবাহ ১৯৯৮

১৯৯৮ সালে বিয়ে করলাম, ইতিমধ্যে ১৯৯৫ থেকে ১৯৯৮ পড়ে ফেলেছি ফরাসি ভাষা, আলিয়ঁস ফ্রান্সেস-এ, একেবারে অ আ ক খ থেকে ডিপ্লোমা অব্দি, চাকরির পাশাপাশিই। আর সেই সময়েই আলাপ হয়েছে তৃণাঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে, আলিয়ঁসের ভয়ানক নিবেদিত, কড়া, অত্যন্ত পড়ুয়া প্রকৃতির এক অধ্যাপক। আমরা যার ক্লাসে গিয়ে ঠক ঠক করে ভয়ে কাঁপি, পড়া তৈরি না থাকলে অথবা হোমওয়ার্ক না করে গেলে।

কিন্তু ধীরে ধীরে সেই কঠোর প্রাণের মানুষটির সঙ্গে একটা মিষ্টি সম্পর্ক তৈরি হয়। এবং তিনি যে অতি ছাত্রপ্রিয় তাও সুবিদিত।

বিয়ে করলাম ১৯৯৮ সালে। ২০০০ সালে আমার মেয়ের জন্ম। ২০০১-এ বদলি হলাম রাঁচিতে আবার। ডেপুটি ডিরেক্টর হিসেবে।

এর পরের মাতৃত্ব, সংসার নানা নতুন অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে যাবার গল্প অন্য কোনোদিন বলা যাবে। যদিও আমার ফরাসি অধ্যাপক স্বামী তৃণাঞ্জন আর মেয়ে চিরায়তাকে নিয়ে আমার আপাত স্থিতিশীল জীবন। আমি চাই স্থিতিশীল থাকুক জীবনটি, তবু, কোথায় যেন বোহেমিয়ান করে দেয় জীবন আমাকে। ভিতরে ভিতরে কবিতার বীজ বহন করা জনিত অস্থিরতা থাকে, আর থাকে ছোট্টবেলা থেকে ঘাড় বাঁকা হবার ফল। বড্ড বেশি সমাজের নানা বৈষম্যের ভাবনা চিন্তায় জারিত। সমাজের অনেক অনেক বাস্তব আমাকে সব সময়ই ধাক্কা দেয়। এই সব কিছু নিয়ে চলেছে। চলেছে। সময়কে লিখি, সময়কে দেখি।